চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

তপন বাগচী

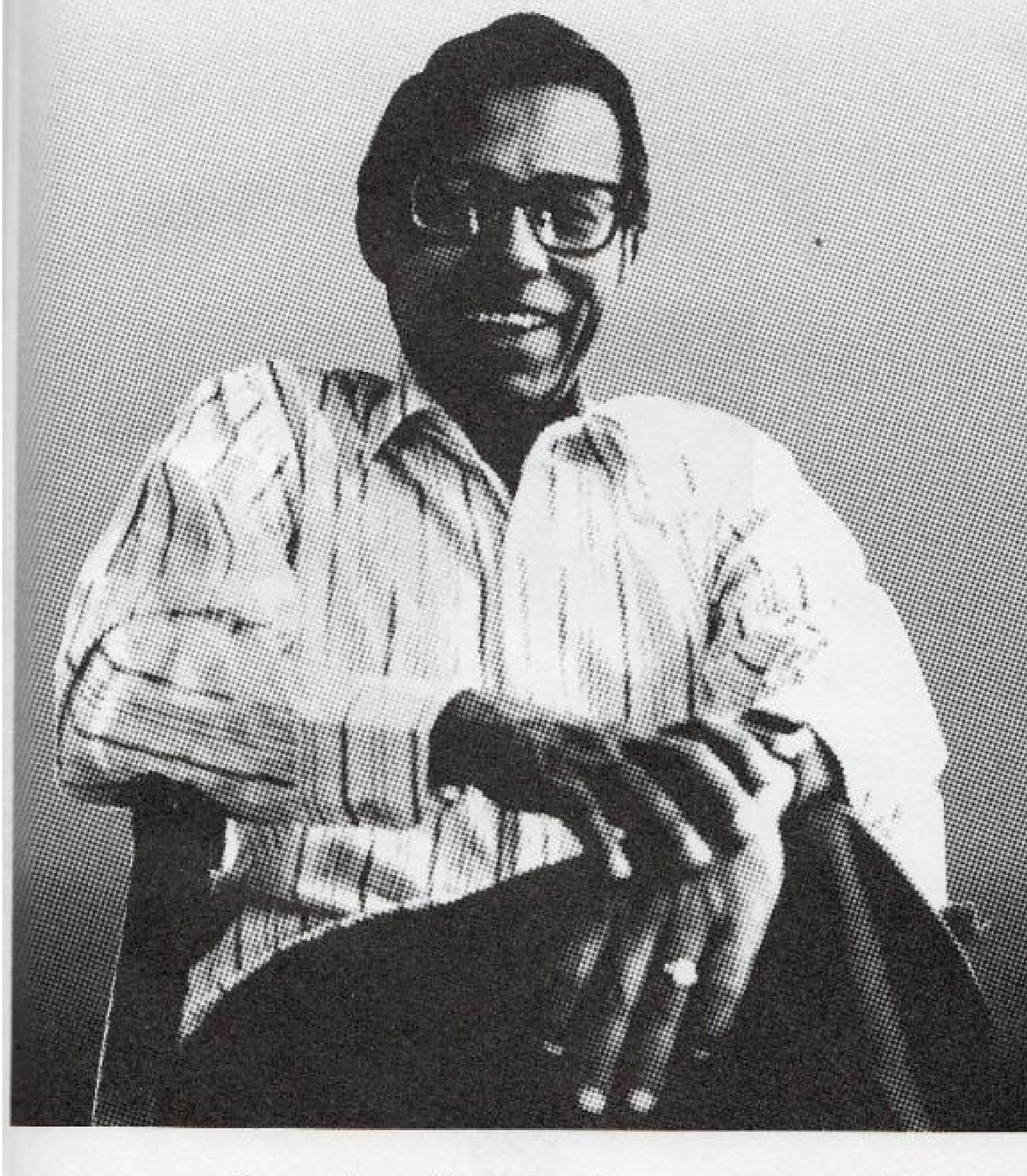

ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮)

আলোকচিত্র : নাসির আলী মামুন

চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

তপন বাগচী

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
ঢাকা

চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
ড. তপন বাগচী

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
শাহবাগ, ঢাকা

প্রকাশকাল
জুন ২০১০

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

আখ্যাপত্রের ছবি
নাসির আলী মামুন

মুদ্রণ
আশরাফ প্রিন্টিং এন্ট প্যাকেজিং
২৬১/৬ ফকিরাপুল
মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য
১০০ (একশত) টাকা মাত্র
US$ 10.00 only

Chalochchitrer Gaane Doctor Mohammad Moniruzzaman by Dr. Tapan Bagchi, Published by Director General, Bangladesh Film Archive, Dhaka; Period of Production : June 2010, Cover Design by Mamun Kaisar, Price: Tk 100 (One Hundred) Only, US$ 10.00 only.

সূচিপত্র

	০৭	প্রকাশকের কথা
	০৯	কৃতজ্ঞতা
	১২	অবতরণিকা
প্রথম অধ্যায়	১৭	বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের উন্মেষ : প্রাসঙ্গিক কথকতা
দ্বিতীয় অধ্যায়	২৫	চলচ্চিত্রের গান : আনুপূর্বিক প্রেক্ষণ
তৃতীয় অধ্যায়	৩৫	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : ব্যক্তি ও শিল্পী
চতুর্থ অধ্যায়	৪৭	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের গান : বিষয়-বিবেচনা
পঞ্চম অধ্যায়	৬১	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের চলচ্চিত্রের গান : নিবিড় পাঠ
ষষ্ঠ অধ্যায়	৮৬	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের চলচ্চিত্রের গানের শ্রেণিবিভাগ
	৮৬	প্রেমের গান
	১২০	বিরহের গান
	১৪২	বাৎসল্যের গান
	১৪৭	বীররসের গান
	১৫৪	মরমি গান
	১৬৩	উপসংহার
	১৬৬	সহায়ক তথ্যপঞ্জি
পরিশিষ্ট ১	১৬৮	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের গানের পরিচালক-সুরকার ও চলচ্চিত্রের নাম
পরিশিষ্ট ২	১৭০	আলোকচিত্রে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

প্রকাশকের কথা

বাংলা সবাক চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার শুরু হয় তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুরারোপের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে গান হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের বাড়তি আকর্ষণ। এমনকি সুরেলা গান ছাড়া উপমহাদেশে কোন চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক সফলতা লাভের আশাও তিরোহিত হয়। অপর পক্ষে গান বাদ দিয়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের দর্শকপ্রিয়তার কথা এখনো চিন্তাই করা যায় না।

কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের এহেন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এই চলচ্চিত্রের গান নিয়ে এদেশে তেমন কোন সিরিয়াস গবেষণা বা প্রকাশনা চোখে পড়ে না। সেই বিবেচনায় এই গ্রন্থটি পাঠকের আগ্রহের বিষয় হতে পারে।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ তাই চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতায় ডক্টর তপন বাগচী প্রণীত 'চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান' শীর্ষক পাণ্ডুলিপি গ্রহন করেছেন। তারই ফসল এ গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের (১৯৩৬-২০০৮) অবদান সুবিদিত। চলচ্চিত্রের গান রচনায় তিনি ব্যক্তিগত সিদ্ধি অর্জন করেছেন, পাশাপাশি সমৃদ্ধ করেছেন চলচ্চিত্রের গানের ধারাকে। চলচ্চিত্রের গান নিয়ে আমাদের দেশে গবেষণাধর্মী কাজ খুবই কম। চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণায় গানের ব্যবহার কিংবা গীতিকারদের অবদান নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনাও দেশে হয়নি। সে অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন গবেষক ডক্টর তপন বাগচী। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের গীতিকার পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রন্থকার বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট এবং চলচ্চিত্রের গানের ধারা নিয়ে সম্যক আলোচনা করেছেন। এই গবেষণার মূল অন্বিষ্ট ছিল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের গানের বিষয় ও শৈলী বিচার এবং শ্রেণীকরণ। এ ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। গবেষণার তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। চলচ্চিত্র গবেষণায় তপন বাগচীর এ উদ্যোগ আরো নতুন গবেষণার প্রেরণা যোগাবে।

গ্রন্থটির নিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র গবেষক ডক্টর সাজেদুল আউয়াল। তাঁর যোগ্য পরামর্শে এ গ্রন্থের মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলচ্চিত্রের প্রতি প্রবল অনুরাগের কারণেই তিনি নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ গ্রন্থের প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিও আমার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ রইল। গ্রন্থটি এদেশের চলচ্চিত্র গবেষক ও সাধারণ পাঠকের উপকারে এলে এ উদ্যোগ সফল বলে বিবেচিত হবে।

ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
ঢাকা
৮ জুন ২০১০

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের উন্মেষ : প্রাসঙ্গিক কথকতা

আজ থেকে ১১৩ বছর আগে (২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৫) প্যারিসের হোটেল ডি ক্যাফেতে অগাস্ট লুমিয়ের (১৮৬২-১৯৫৪) ও লুই লুমিয়ের (১৮৬৪-১৯৪৮) নামে দুই ভাই চলচ্চিত্রের প্রথম সফল বাণিজ্যিক প্রদর্শনী করেন। এই সময়কেই চলচ্চিত্রের সূচনাবিন্দু ধরা হয়। তখন একে 'বায়োস্কোপ' নামেই ডাকা হত। ভারতীয় উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী হয় ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই। লুমিয়ের ভাইদের একজন মুম্বাই শহরের ওয়াটসন হোটেলে এই প্রদর্শনী করেন। ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বায়োস্কোপের প্রদর্শনী হয়।

বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রথম বায়োস্কোপ প্রদর্শনী হয় কলকাতার ব্রেডফোর্ড বায়োস্কোপ কোম্পানির উদযোগে ১৮৯৮ সালের ৪ এপ্রিল বাকেরগঞ্জ জেলার ভোলা মহকুমার (অধুনা ভোলা জেলা) এসডিওর (অধুনা ডিসি) বাংলোতে। ১৭ এপ্রিল বায়োস্কোপ প্রদর্শনী হয় ঢাকায় পাটুয়াটুলীর ক্রাউন থিয়েটারে। গবেষক অনুপম হায়াতের অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, এই সব চলচ্চিত্রের মধ্যে ছিল মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি মিছিল, গ্রিস ও তুরস্কের যুদ্ধ, তিনশত ফুট উঁচু থেকে প্রিন্সেস ডায়ানার লাফ, রাশিয়ার সম্রাট জারের অভিষেক, পাগলা নাপিতের ক্ষৌরকর্ম, সিংহ ও মাহুতের খেলা, ইংল্যান্ডের তুষারপাতে ক্রীড়া, ফ্রান্সের রাস্তাঘাট ও পাতাল রেলপথ ইত্যাদি। তখনও বায়োস্কোপের মাধ্যমে এই চলচ্চিত্র দেখার জন্য সাধারণ দর্শকের টিকেটের ব্যবস্থা ছিল।

ঢাকার পাটুয়াটুলী ছাড়াও জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়), ভিক্টোরিয়া পার্ক (বাহাদুর শাহ্ পার্ক), আহসান মঞ্জিল এবং ঢাকার বাইরে তৎকালীন মানিকগঞ্জ মহকুমার (অধুনা জেলা) বগজুরি গ্রামে, জয়দেবপুরে (অধুনা গাজীপুর জেলা) ভাওয়াল এস্টেটের রাজপ্রাসাদে, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার (অধুনা শরিয়তপুর জেলা) পালং-এ বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। রাজশাহী শহরের বোয়ালিয়া জমিদার শরৎকুমার রায়ের বাড়িতে বায়োস্কোপ দেখানো হয় ১৯০০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কয়েক দিন ধরে। স্থানভেদে টিকেটের দামের তারতম্য ছিল। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক

'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রিকায় এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।[১] ঢাকার আরমানিটোলার পাটের গুদাম থেকে নিয়মিতভাবে বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর গৌরবের অভিযাত্রা সূচিত হয় ১৯১৩-১৪ সালে। পরে এখানেই নির্মিত হয় ঢাকায় বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা হল 'পিকচার হাউজ', যা পরে 'শাবিস্তান' নামে রূপান্তরিত হয়।

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার (অধুনা জেলা) বগজুরী গ্রামের হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) দ্য রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি গঠন করে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করেন। ১৯৯৮ সালে সালে প্রতিষ্ঠিত এই 'দ্য রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি'ই বাঙালির প্রথম চলচ্চিত্র-প্রচেষ্টা। অবিভক্ত বাংলার প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও হীরালাল সেনের নাম নাম স্বীকৃত। বিভিন্ন স্থানে অভিনীত নাটকের খণ্ডিত অংশের চিত্রায়ণ করে ১৯০১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ক্ল্যাসিক থিয়েটারে প্রদর্শন করেন। প্রামাণ্যচিত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং সংবাদচিত্রও নির্মাণের পথিকৃৎ হিসেবেও হীরালাল সেন নমস্য ব্যক্তি।

দাদাসাহেব ঢুণ্ডিরাজ গোবিন্দ ফালকে হলেন উপমহাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের নির্মাতা। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তিনি 'দাদাসাহেব ফালকে' নামেই বেশি পরিচিত। ১৯১৩ সালে তাঁর নির্বাক চিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র' মুক্তি পায়। ১৯১৬ সালে কলকাতায় ম্যাডান থিয়েটার্স কোম্পানির পক্ষ থেকে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত প্রথম বাংলা নির্বাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'বিল্বমঙ্গল' মুক্তি পায়। ১৯১৯ সালের ৮ নভেম্বর মুক্তি পাওয়া এই চলচ্চিত্রের পরিচালকের নাম নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কোনও কোনও গবেষক এই চলচ্চিত্রের পরিচালক হিসেবে রোস্তমজি দুতিওয়ালার নাম উল্লেখ করেন। এই চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঢাকার নওয়াব এস্টেটের ম্যানেজারের পুত্র প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি পরে চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২১ সালে কলকাতায় 'বিলাত ফেরৎ' নামে একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। এর প্রযোজক ও অভিনেতা ছিলেন বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯২৭-২৮ সালে ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। নওয়াব পরিবারের কয়েকজন তরুণ সংস্কৃতিসেবী নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র 'সুকুমারী'। এর পরিচালক ছিলেন জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন ক্রীড়াশিক্ষক অম্বুজপ্রসন্ন গুপ্ত। চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা ছিলেন খাজা নসরুল্লাহ ও সৈয়দ আবদুস সোবহান। উল্লেখ্য তখন নারীদের অভিনয়ের রেওয়াজ চালু হয়নি।

নওয়াব পরিবারের ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানির প্রযোজনায় অম্বুজপ্রসন্ন

---

১ মুহম্মদ লুৎফুল হক, রাজশাহীতে বায়োস্কোপের আদিপর্ব, *'স্থানীয় ইতিহাস'*, (ড. আবুল কাশেম সম্পাদিত), হেরিটেজ, রাজশাহী, মার্চ ২০০৮, পৃ. ১২৬

গুপ্ত নির্মাণ করেন নির্বাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'দ্য লাস্ট কিস'। তবে এতে নারীচরিত্রে নারীরাই অংশ নেয়। নায়িকা চরিত্রে ছিলেন লোলিটা বা বুড়ি নামের এক যৌনকর্মী। চারুবালা, দেববালা বা দেবী নামের আরও দুই যৌনকর্মী এতে অভিনয় করেন। হরিমতি নামে একজন অভিনেত্রীও এতে অভিনয় করেন। ১৯৩১ সালে এই চলচ্চিত্র মুক্তি পায় ঢাকার 'মুকুল' হলে (অধুনা 'আজাদ' হল)। এর প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০)। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৩৬-১৯৪২) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ওবায়েদ-উল হক 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' (১৯৪৬) প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন হিমাদ্রী চৌধুরী ছদ্মনামে। বাংলাদেশী কোনও মুসলিম পরিচালকের হাতে নির্মিত এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র। উদয়ন চৌধুরী ছদ্মনামে ইসমাইল মোহাম্মদ নির্মাণ করেন 'মানুষের ভগবান' (১৯৪৭) চলচ্চিত্রটিও। দেশভাগের পরে ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রযোজনা-পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান এবং স্টুডিও নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে নাজীর আহমদ (১৯২৫-১৯৯০) 'ইন আওয়ার মিডস্ট' নামে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন, যা বাংলাদেশ-ভূখণ্ডের প্রথম তথ্যচিত্র হিসেবে স্বীকৃত।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর সরকারি কাজের প্রচারচিত্র নির্মাণের জন্য জনসংযোগ বিভাগের অধীনে চলচ্চিত্র ইউনিট (১৯৫৩) গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে এখান থেকে নাজীর আহমদের পরিচালনায় নির্মিত হয় প্রামাণ্য চিত্র 'সালামত'।

নাজীর আহমদ একাধারে অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা, বেতারকর্মী ও লেখক। ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি শিল্পী হামিদুর রাহমান ছিলেন তাঁর সহোদর। ১৯৫৫ সালে নাজীর আহমদের উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম ফিল্ম ল্যাবরেটরি ও স্টুডিও চালু হয়। তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা'র প্রথম নির্বাহী পরিচালক হন। তাঁর কাহিনী থেকে ফতেহ লোহানী নির্মাণ করেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'আসিয়া' (১৯৬০)। 'নবারুণ' (১৯৬০) নামের একটি প্রামাণ্য চিত্র। 'নতুন দিগন্ত' নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন নাজীর আহমদ।

১৯৫৪ সালে গঠিত হয় ইকবাল ফিল্মস এবং কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড। ১৯৫৪ সালে ইকবাল ফিল্মসের ব্যানারে এই ভূখণ্ডের প্রথম চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর কাজ শুরু করেন আবদুল জব্বার খান। কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্সের ব্যানারে স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের 'আপ্যায়ন'-এর কাজ শুরু করেন সারোয়ার হোসেন। ১৯৫৫ সালে জুন মাসে তেজগাঁওয়ে সরকারি ফিল্ম স্টুডিও চালু হয়।

১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট আবদুল জব্বার খান পরিচালিত বাংলাদেশের প্রথম সবাক বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' মুক্তি পায়। পরিচালক নিজেই নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। নায়িকা চরিত্রে ছিলেন চট্টগ্রামের পূর্ণিমা সেন।

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধু, পরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃত) উত্থাপিত বিলের মাধ্যমে 'পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি) প্রতিষ্ঠিত হলে এর সহযোগিতায় ১৯৫৯ সালে থেকে প্রতিবছর চলচ্চিত্র মুক্তি পেতে থাকে। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে এদেশে কোনও চলচ্চিত্র মুক্তি পায় নি। এফডিসি ছাড়াও পপুলার স্টুডিও, বারী স্টুডিও এবং বেঙ্গল স্টুডিও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পরিস্ফুটনে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

এফডিসি প্রতিষ্ঠার পরে চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অনেক যোগ্য ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। ১৯৫৯ সালে ফতেহ লোহানীর 'আকাশ আর মাটি', মহিউদ্দিনের 'মাটির পাহাড়', এহতেশামের 'এদেশ তোমার আমার'– এই তিনটি বাংলা চলচ্চিত্র ছাড়াও এ.জে. কারদারের 'জাগো হুয়া সাভেরা' উর্দু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শুরুর দশকে নির্মিত ৫টি চলচ্চিত্রের প্রতিটিই নানান সীমাবদ্ধাতা সত্ত্বেও শিল্পমানে উত্তীর্ণ বলেই চলচ্চিত্রবোদ্ধারা মনে করেন। অর্থাৎ আমাদের চলচ্চিত্রের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল শুদ্ধতার অঙ্গীকার নিয়েই। উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রও তৈরি হয়েছে সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শুরু হয়েছে ডাকাতের কাহিনী নিয়ে। আবদুল জব্বার খান রচিত নাটক 'ডাকাত'-এর চিত্রায়নই 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬)। এই চলচ্চিত্রে পেশাদারিত্বের ছাপ থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রথম চলচ্চিত্র হিসেবে এর গুরুত্ব রয়েছে। গ্রামের এক জোতদার বাবার এক সন্তান ঘটনা-পরম্পায় ডাকাতদলের খপ্পরে পড়ে তাদের মতো বেড়ে ওঠে। আরেক ছেলে পড়ালেখা করে পুলিশ হয়। কিন্তু ডাকাতদলের সঙ্গে পুলিশের সখ্য ছিল। ভাই-ভাই পরিচয় না জানলেও ডাকাত-পুলিশ সম্পর্ক ছিল। এক পর্যায়ে ডাকাত ছেলে তার সর্দারকে খুন করে। গ্রেফতার হয় অসৎ পুলিশ। কাহিনীর পরিণতি বাবার কাছে দুই ছেলেকে ফিরে পাওয়ার মধ্য দিয়ে। কাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। নাটকীয় উপাদান আছে। গ্রামীণ বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আছে। আবদুল আলীমের কণ্ঠ আছে। গওহর জামিলের নৃত্য আছে। নায়িকার ভূমিকায় ভদ্রঘরের মেয়ে আছে। ডাকাত-পুলিশের গল্প থাকায় একধরনের সাসপেন্স আছে। নির্মাণকলার সীমাবদ্ধতা থাকলেও এই চলচ্চিত্রকে অসফল বলার সুযোগ নেই। আবদুল জব্বার খান (১৯১৬-১৯৯৩) 'জোয়ার এলো' (১৯৬২), 'নাচঘর' (উর্দু ১৯৬৩), 'বাঁশরী' (১৯৬৮), 'কাচ কাটা হীরা' (১৯৭০) ও 'খেলাঘর' (১৯৭৩) নির্মাণ করে চলচ্চিত্রশিল্পে তাঁর অবদানের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি বাংলাদেশে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের পথিকৃৎ।